ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' ভ্রমণ : আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকল্প ও প্রয়াস

ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালির ইউরোপ ও এশিয়া বেড়ানোর বৃত্তান্তগুলির একটি তুলনামূলক পাঠগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমি বুঝতে চাইব, দেশ বেড়ানোর কথনগুলি কি আদতে উপনিবেশাশ্রিত একটি জাতির 'আত্মপ্রতিষ্ঠা' তথা 'আত্ম-অনুসন্ধান'-এর, তাদের মনন-চেতনের নিরন্তর চাপানোতরকে প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে?

আমার গবেষণাপত্রকে আমি মোট ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছি:

১। প্রস্তাব ২। পটভূমি ৩। প্রসঙ্গ : ইউরোপ ভ্রমণ ৪। প্রসঙ্গ : এশিয়া ভ্রমণ ৫। পর্যালোচনা ৬। পরিশেষে

এইবার আমি প্রতিটি পর্বের সারাংশের উপর ভিত্তি করে আমার মূল আলোচনাটি করব।

ভ্রমণবৃত্তান্তের কথনশৈলী বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ডেবি লিসলে বলেন-"...travelogues are usually fashioned over and against a series of others who are denied the power of representing themselves"[1]। আমরা বুঝতে পারি তিনি আসলে, ভ্রমণবৃত্তান্তের কথনশৈলীকে এক অসম ক্ষমতা বিন্যাসের আধার হিসেবে দেখছেন যেখানে গন্তব্যস্থল বা তার বাসিন্দারা ভ্রমণকারীর এক নির্বাক-নিষ্ক্রিয় 'অপর' মাত্র। প্রসঙ্গত লিসলের মতো অনেক ইউরোপীয় তাত্ত্বিকই ভ্রমণবৃত্তান্ত নামক সাহিত্যসংরূপটির বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একধরনের ক্ষমতা প্রকাশের প্রকল্পায়নের কথা বলছেন। বিশেষত

---

[1]Debbie Lisle, "The Cosmopolitan gaze: rearticulations of modern subjectivity", *The Global politics of Contemporary Travel writing* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), পৃষ্ঠা- ৬৯.

পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতক থেকে শুরু সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশ বিস্তারের পর্বে, ইউরোপ বহির্ভূত বিশ্বের উপর ইউরোপের নানা দেশের আগ্রাসনের সঙ্গে তাঁরা ভ্রমণের এক নিবিড় যোগাযোগের উপরে জোর দিচ্ছেন। তাঁদের মনে হয়েছে, উপনিবেশ সম্পর্কে উপনিবেশক দেশের ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত তথা প্রকাশিত ধ্যানধারণা আদতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব কায়েমেরই এক সুচারু পন্থা হয়ে উঠেছে। নতুন দেখা দেশ বা মানুষরা সেখানে 'নির্মিত' হয়েছে বিপরীত যুগ্মপদের মানদণ্ডে- 'শিক্ষিত' 'সুসভ্য' 'সাহসী' ভ্রমণকারীর এক অধস্তন ও অভিব্যক্তিহীন 'অপর' পক্ষ হিসেবে। কিন্তু মুশকিল হল, ক্ষমতার সাপেক্ষে অনুধাবিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই ভ্রমণ-তত্ত্বের সূত্র ধরে শুধু প্রভুত্বকামীর ক্ষমতার আস্ফালনের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। সেখানে ক্ষমতাশূন্যের কোনো উচ্চারণ আমরা শুনতে পাইনা। কিন্তু ক্ষমতাশালীবর্গ নির্দিষ্ট এই 'অপর' যখন ভ্রমণের 'বিষয়' থেকে 'বিষয়ী' হয়ে উঠে সক্রিয় ভ্রমণকারীর পদে উন্নীত হয়, তখন কী হয়? এতক্ষণ যারা অপর বলে পর্যুদস্ত হচ্ছিল, তারা যখন 'আত্ম'-এর ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তখন তারা কি ক্ষমতাসীন মহলের অবদমন বা উন্নাসিকতাকেই আত্মস্থ করে নেয়? নাকি তাদের বৃত্তান্তগুলি ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে আত্ম-প্রতিরোধ তৈরি করে ভ্রমণের কোনো প্রতিকথন তৈরি করতে চায়? ক্ষমতাহীনের আত্মপ্রকাশের এই বিপরীতমুখী ছকটির পাঠগ্রহণই আমার গবেষণার মূল আবর্তন। একদিকে দেখতে চাইব, বাঙালি যখন পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হয়ে তার ঔপনিবেশিক প্রভু 'ইংল্যান্ড' তথা ইউরোপকে দেখতে যায় তখন পদানতের হীনম্মন্যতা, ঔপনিবেশিক-উপনিবেশিতের অসম ক্ষমতা-সম্পর্ক তার দৃষ্টিপথকে কীভাবে অভিভূত করে? অন্যদিকে দেখতে চাইব, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বেড়ানোর সময়, যাদের সঙ্গে বিসম ক্ষমতাসম্বন্ধের আড়ষ্টতা নেই, বরং অনেক সময়েই দেশগুলিকে 'সুপ্রাচীন' ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার ঋণবাহী ভেবে একধরনের 'আত্মশ্লাঘা' আছে, সেখানে ভ্রমণকারীদের 'বহির্দশন' এবং সেইসুবাদে গড়ে ওঠা 'আত্মদর্শন' কোন্ পথে চালিত হয়?

আলোচনা শুরুর আগেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার, 'উপনিবেশিত পর্বের বাঙালির ভ্রমণ' বলতে আমরা ঠিক কোন্ সময় এবং কোন্ কথনগুলিকে ধরতে চাইছি? খাতায়-কলমে, ভারত তথা বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশের শুরু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে, পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে। কিন্তু, এই আলোচনায় 'উপনিবেশিত পর্ব' বলতে আমরা শুধু রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক আগ্রাসনের আরম্ভকেই সূচিত করতে চাই না, সবিশেষ জোর দিতে চাই শাসিতের উপর শাসকের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব নির্মাণের রাজনীতিটির উপরে। যে রাজনীতির ডালপালা বিস্তার শুরু হয় উনিশ শতকে, যখন আইন-অর্থনীতি-রাজনীতির পাশাপাশি এদেশের শিক্ষানীতির নিয়ন্ত্রণও চলে যায় ঔপনিবেশিকদের হাতে। এবং যার, অনতিক্রম্য অভঘাত গ্রহণ করে প্রধানত উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিন্দু/ব্রাহ্মরা। জন্ম হয়, ইংরেজি শিখতে তৎপর- 'নব্য' বাঙালিদের। এই আলোচনার মূল আবর্তনে আছেন এই ভ্রমণকারীরা। তাই, যদিও ঔপনিবেশিক বাংলায় প্রকাশিত প্রথম বিলেত সফর-বৃত্তান্ত *বিলায়েত নামা (The Wonders Of Vilayet)* [2] প্রকাশ পাচ্ছে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে, ফার্সিতে। লিখছেন মির্জা শেখ ইতেসামুদ্দিন। রাজা তৃতীয় জর্জের দরবারে, বাদ্‌শাহ শাহ্ আলমের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ড যাত্রা ও সে দেশে (১৭৬৪-১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ) তিন বছর বসবাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। কিন্তু আমাদের নির্বাচিত কথনগুলির সময়কাল আরও কিছু বছর পেরিয়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, মেকলে পরিকল্পিত শিক্ষনীতি যখন বাংলায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত, তখন থেকে শুরু হবে। কারণ, সাল-তারিখের বিচারে ঔপনিবেশিক আমলের হলেও, "প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা

[2] Mirza Sheikh I'tesamuddin, *The Wonders of Vilayet : Being the Memoir, Originally in Persian, of a Visit to France and Britain*, Kaiser Haq (Trans.), (Leeds : Peepul Tree Press, 2001).

হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ"[3]- মননগত এই উপনিবেশায়নের সঙ্গে পরিচয় ইতেসামুদ্দিনদের ছিলনা। ইংরেজি শিক্ষা বা পাশ্চাত্যবীক্ষা তখনো উৎকর্ষের চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়নি।[4] আগামী একশ বছরে এই ছবি বেমালুম পাল্টে যায় এবং সেই বদলের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বা বলা ভালো এসবের অনিবার্য পরিণাম হিসেবেই বদল হয় ভ্রমণকারীদের ধর্ম, ভাষা, রুচি, শিক্ষা। এবং এই বৃত্তান্ত লিখিয়েদের কেউই ইতেসামুদ্দিনের মতো, নিছক অজানা-অদেখা দেশ-সংস্কৃতি দেখার কৌতূহল নিয়ে বিলেত পাড়ি দেননা। বরং ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজব্যবস্থার বিবিধ পাঠের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ তথা ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাঁদের এক নিবিড় পরিচিতি তথা মুগ্ধতাবোধ গড়ে ওঠে ছোট থেকেই। ফলে খুব স্বভাবতই ইতেসামুদ্দিনদের অনুভব-কাঠামো, ভাবনা-বিশ্বাসের সঙ্গে এই ভ্রমণকারীদের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত জীবনচর্যার এক বিষম ব্যবধান গড়ে ওঠে। বস্তুত এই ব্যবধানকেই সীমন্তী সেন চিহ্নিত করছেন pre-colonial এবং colonial– দুই ভিন্ন ভাবসঞ্জাত বিশ্ব হিসেবে। তাঁর ব্যাখ্যায়- "Here the term 'pre-colonial' is not indicative simply of temporal precedence; it is meant to refer to a different vision of world order, a different sense of historicity and most significantly a different sense of I and other."[5] আমাদের আলোচনার ঝোঁকও এই 'pre-colonial' পরবর্তী অধ্যায়ের, ইংরেজি শিক্ষা ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তগুলি নিয়েই। এবং এই পর্বের, প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্তটি

---

[3]বঙ্গযুবাদের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের গভীরতা বিষয়ে উক্তিটি করছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* বইতে (নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১০২)।

[4]Simonti Sen, "Of Another East and Another West", *Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives 1870-1910* (Oriental Longman Private Limited, 2005), পৃষ্ঠা-২৮.

[5]প্রাগুক্ত।

লেখাও হচ্ছে ইংরেজিতে, রমেশচন্দ্র দত্তের *Three Years in Eutope*[6]। ব্যারিস্টারি পড়তে, তিন বছরের (১৮৬৮-১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ) জন্য ইংল্যান্ডে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে।[7] এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের পর ভারত থেকে ইংল্যান্ডের যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য যখন অনেকটাই কমে যায়, তখন উচ্চশিক্ষার্থে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে বা ইউরোপ তথা ইংল্যান্ড ভ্রমণের আকর্ষণে যাত্রী সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। সাহেবদের দেশ বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহলের চাহিদা মেটাতে বা স্বাধীন দেশের হাল-চাল সম্পর্কে পরাধীন জনগণকে ওয়াকিবহাল্ করে তুলতে উনিশ শতকের ক্রমপরিস্ফুট গদ্যসাহিত্যের জগতে ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার ধারা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং বেশীরভাগ ভ্রমণকারীই একপ্রকার নিশ্চিত থাকেন যে ভারতের মতো পরাধীন দেশের দুর্দশা ঘোচানোর আসল দাওয়াই ইংরেজদের মতো ‘স্বাধীন’ জাতির জীবনযাপনকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার মধ্যেই আছে।

ভ্রমণের শিক্ষা-অভিজ্ঞতার সুফলকে পরাধীন দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব যে তাঁরা বহন করছেন সেই কথা তাঁদের কথনের পরতে পরতে দাবি করা হয়। কালাপানি পেরিয়ে, সামাজিকভাবে জাতিচ্যুত হওয়ার ভয় উপেক্ষা করে এই ভ্রমণের ‘মহৎ’ উদ্দেশ্য বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণভাবিনী সকলেই নিশ্চিত থাকেন।

---

[6]Romesh Chandra Dutt, *Three Years in Europe, 1868-1871* (*including an account of his second visit in 1886)*, (Calcutta, 1896).
রমেশচন্দ্রের প্রথমবারের বিদেশ যাত্রার বিষয়ে লেখা চিঠিগুলি বাংলাতেও প্রকাশিত হচ্ছে পরবর্তী কালে : *ইয়ুরোপে তিন বৎসর অর্থাৎ ইউরোপবাসিদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় ও নানাদেশ বর্ণনাবিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ* (বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২৯০)। এই গবেষণাপত্রে আমরা বাংলা বইটি থেকেই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি।

[7]যদিও এর বেশ কিছু বছর আগে থেকেই উচ্চবিত্ত শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপ যাত্রার ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্তের মতো আরও অনেকেই বিবিধ কর্মসূত্রে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের লেখা বিক্ষিপ্ত ডায়েরি বা কিছু চিঠি বাদ দিলে রমেশচন্দ্রের বইটিকেই প্রথম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রিটিশ শাসনের সার্বিক মঙ্গলময়তা সম্পর্কে অগাধ আস্থা নিয়ে, ইউরোপীয়বীক্ষায় বুঁদ হয়ে থাকা ভ্রমণকারীরা যখন ইউরোপের মাটিতে সত্যিই পা রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন তখন তাঁদের দৃষ্টিতে কি আদৌ ইউরোপের কোনো মৌলিক ছবি ধরা পড়েছিল? নাকি ইংরেজি বইতে পড়া অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারেই ভরাডুবি হয়েছিল ভ্রমণকারীর নিজস্ব পর্যবেক্ষণক্ষমতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই নব্য বাঙালির গল্প শুধু অবিমিশ্র পাশ্চাত্যপ্রেমেই শেষ হয় না, সেখানে ঔপনিবেশিক অবদমনের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও থাকে। থাকে বিদেশী শাসকের থেকে নিজের অস্তিত্বের পৃথকীকরণের প্রচেষ্টাও। বস্তুত ইংরেজ শাসনের উপর ভরসার সমান্তরালেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা- এই দুই বিপ্রতীপ ভাবের অসহজ অবস্থানের মধ্যে দিয়েই এলিট সমাজ তার জাতিসত্তা নির্মাণের প্রকল্পটিকে গড়ে তুলতে চায়। গড়ে তুলতে চায় এক আধুনিক কিন্তু অ-ইউরোপীয় সত্ত্বা। পার্থ চ্যাটার্জী যাকে বলছেন anticolonial natioanalism।[8] তাঁর ব্যাখায়, উপনিবেশিতদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অনুধাবন করতে হবে এক বিভাজনের মানদণ্ডে – বহির্ভূমি (Outer Domain) ও অন্তর্ভূমি (Inner Domain)। বহির্ভূমি তৈরী হয় রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি জাগতিক (Material) নানা ক্রিয়ার সমন্বয়ে । আর অন্তর্ভূমিতে থাকে ধর্ম, সামাজিক নীতিবোধ, আচার-সংস্কৃতি ইত্যাদির মতো নানা অধি-জাগতিক (Spiritual) ভাবনা। তাই কৃষ্ণভাবিনীর বই-এর

---

[8]Partha Chatterjee, “Whose Imagined Community” (*The Nation And Its Fragments*, Princeton University Press, 1993).
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিতে, “The most powerful as well as the most creative results of the nationalist imagination in Asia and Africa are posited not on an identity but rather on a difference with the “modular” forms of the national society propagated by the modern West. How can we ignore this without reducing the exoerience of anticolonial nationalism to a caricature of itself?” (পৃষ্ঠা -৫)

প্রকাশকমশাই যখন সতর্ক করেন, বিদেশে গিয়ে ভারতসন্তান যেন 'ভারতীয় হৃদয়' না হারিয়ে ফেলে বা রাজনারয়ণ বসু তাঁর জামাইকে ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে সাবধানবাণী শোনান আমরা বুঝতে পারি তাঁরা আসলে অনুকরণ আর স্বকীয়তার টানাপোড়েনের এই টেনশনেই আক্রান্ত হচ্ছেন। এবং অন্যান্য ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্তগুলির বিশদ পাঠ নিলেও আমরা দেখব, এই গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব সেখানেও প্রায়শই এক বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে ওঠে। একদিকে তাঁরা ইংরেজদের জ্ঞানস্পৃহা, রাজনীতিসচেতনতা, বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শিতা, নিয়মনিষ্ঠা, শিক্ষাব্যবস্থা, নারীশিক্ষা, শারীরিক বলবীর্যের বিশেষ প্রশংসা করছেন। তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক, শৌখিন তথা সুশৃঙ্খল গার্হস্থ্যচিত্র, নারী-পুরুষের স্বচ্ছন্দ মেলামেশাকে ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয় মনে করছেন। অন্যদিকে প্রায় প্র্যতেকেই ইংরেজদের অতিরিক্ত অর্থপ্রীতি, স্বার্থপরতা, ফ্যাশন সর্বস্বতা, মদ্যপান বা বাহ্যিক আড়ম্বরের তুলনায় ভারতীয় জীবনধারাই অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক বলে অনুভব করেছেন। আমরা বুঝতে পারি, পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে, ভ্রমণজাত কোনো পর্যবেক্ষণই নিছক ব্যক্তিক স্তরে আবদ্ধ থাকে না, বরং এক সমীক্ষাবাদী বিশ্লেষণ হয়ে উঠতে চায়। যাবতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গেই জুড়ে যায় স্বদেশ বিষয়ক তুলনা-আলোচনা-সমালোচনা। বহির্দর্শনের সমান্তরালেই গড়ে উঠতে থাকে আত্মদর্শনের নানা পাঠ। বস্তুত ভ্রমণকথনগুলি পড়তে পড়তে আমরা টের পাই বাঙালির বিলেত ভ্রমণ আসলে বহুলাংশে দীর্ঘলালিত স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মোলাকাত হওয়ার গল্প। যেখানে বইতে পড়া তথ্যগুলিকে প্রায় তালিকা মিলিয়ে দেখার প্রয়াসের মধ্যেই তালিকা বহির্ভূত নানা জিনিসও সামনে এসে পড়ে। ইংরেজ সমাজের নানা ভাগাভাগি ধনী-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজের পারস্পরিক ভেদ, আপাত চাকচিক্যের মাঝে দারিদ্য, শ্রমিক শ্রেণির বিক্ষোভ ইংরেজ জাতি সম্পর্কে গড়ে তোলা পূর্বসঞ্চিত ভাবনাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করে ভ্রমণ আদতে কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যবর্তী এক পরিসর নির্মাণ করে নেয়। যেখানে শাসক জাতি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা-বিশ্লেষণ করার এমনকী

কোনো কোনো বিষয়ে স্বজাতিকে এগিয়ে রাখতে পারা যায়। জুলি.এফ.কডেল যেমন মনে করেন, ভারতীয়দের ইংল্যান্ড বা ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলি আদতে 'ইউটোপিয়া' আর 'ডিসটোপিয়া'-র মধ্যবর্তী স্তর 'এটোপিয়া'-র নির্মাণ করে যা পরাধীন জাতিকে একাধারে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং নিজেদের জাতিগত ভবিষ্যত বিষয়ে বক্তব্য পেশের সুযোগ তথা স্বাধীনতা দেয়। উপনিবেশের অসম শাসনযন্ত্রের মধ্যে যেখানে শাসক বা তার শাসন সম্বন্ধে কোনোরকম আলোচনা বা সমালোচনা করার অধিকার থাকে না সেখানে শাসিত জাতির জন্যে এই আপাত অবিশ্বাস্য কাজটির সুযোগ আদায় করে দিতে পারে ভ্রমণ। তিনি তাঁর "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives" প্রবন্ধে, ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার মাধ্যমে উপনিবেশিত মননের ক্ষমতা উদ্‌যাপনের এই বিশেষ অভিব্যক্তিটি ব্যাখা করে লেখেন, "Between British and Indian utopias and dystopias, Indian travellers wrote an atopia, a virtual space, in which they had the authority to criticize Britain and to determine India's future. This atopia was the product of their travel, which made comparisons and judgments possible.[9] আর আত্মপ্রকাশের এই সম্যক ক্ষমতা শাসিতের অবস্থানের একধরনের ক্ষমতায়ন ঘটাতে থাকে। এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকরকে, বিসম নানা নিয়মনীতিকে, সর্বোপরি শাসকের ঔদ্ধত্য তথা প্রশ্নহীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে সওয়াল-জবাব করার আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে থাকে বিশ শতকের কথনগুলিতে। জাতীয়তাবাদ যত ডালপালা

[9] Julie F. Codell, "Reversing the Grand Tour: Guest Discourse in Indian Travel Narratives", Source: Huntington Library Quarterly, Vol. 70, No. 1 (March 2007), pp. 173-189, Published by: University of California Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/hlq.2007.70.1.173, Accessed: 03/06/2013 05:38.

বিস্তার করে, যুদ্ধধস্ত ইউরোপের প্রতি পূর্ববর্তী নিখাদ মুগ্ধতা যত নড়বড়ে হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইচ্ছে যত স্পষ্ট হয় ভ্রমণকারীরা নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানের বিষয়ে তত বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন। তাই উনিশ শতকের কথনে ত্রৈলোক্যনাথ যেমন বারেবারে নিজেকে মাহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুগত প্রজা হিসেবে প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন বা কেশবচন্দ্র সেন ভারত ইংল্যান্ডের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার আকুতি জানিয়েছিলেন উপনিবেশাশ্রিতের সেই আত্মদর্শনেও নতুন বাঁক আসে। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের বিশ্বপরিচিতির উপর ভর করে উপনিবেশিতের পাল্টা উবাচ জোরদার হতে থাকে। যদিও ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধতার পুরনো চিত্রকল্পগুলি মুছে যায়না, তবে বালক মধুসূদনের যেমন অ্যাল্বিনো তীরকেই মনে হয়েছিল ‘as if she were my native land”, বিশ শতকের উপনিবেশিতের কথনে, শাসিতের কল্পনায় স্বদেশের মানচিত্র যত স্পষ্ট হয় ‘ঘর’-এর এমন স্থানবিপর্যাস আর হয়না। বরং স্বদেশের অবয়ব অনুসন্ধানের তাগিদ ক্রমশ বাড়তে থাকে কথনগুলিতে। এবং এই তাগিদেরই আরেক অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা দেখব এশিয়ার নানা দেশ-অঞ্চল বেড়ানোর অভিজ্ঞতাগুলিকে। এবং এশিয়া বলতে এক্ষেত্রে আমরা বুঝব মূলত বিশেষ কয়েকটি দেশের কথা– চিন, জাপান, বর্মা বা অধুনা মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। পরাধীন জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকল্প ও প্রয়াসের এই পাঠে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাত্রাকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারব না- ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এই সফর যা নিছক পারস্য ভ্রমণ নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের নানা জটিলতা অনুধাবনের, তৎকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতি বিচারের এক অতি জরুরি ভাষ্য হয়ে ওঠে। তাই আমাদের উল্লিখিত দেশগুলি বিষয়ে রচিত লেখাগুলির পাশাপাশি নানা অনুষঙ্গে-প্রসঙ্গে আমরা “পারস্যে”[10]-র উপরেও চোখ রাখব। উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকেই অর্থনৈতিক অধগতি, বৈষম্যমূলক নানা নীতি, অনুন্নত শিক্ষা

[10] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *“পারস্যে”, রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৩৯৬)।

পরিকাঠামো, সামাজিক-মানবিক অবমাননার অসংখ্য ঘটনার সূত্র ধরে বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত (আমাদের আলোচ্য শ্রেণি) শ্রেণির মনে ঔপনিবেশিক প্রশাসন বিষয়ে ক্ষোভ জমা হতে শুরু করে, ফলত যে ইংরেজ অনুগত বাঙালি একসময় পাশ্চাত্যবীক্ষায় দীক্ষিত হতে উঠেপড়ে লেগেছিল তারাই দেশ তথা জাতির নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের 'বিশুদ্ধ' রূপটিকে খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এবং পরাধীন জাতির আত্মনির্মাণের ভিত্তিভূমি শুধু দেশের সীমানাতেই গণ্ডীবদ্ধ থাকে না বরং এক ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত পরিসর লাভ করতে চায়। খুঁজে পেতে চায় এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিচয়। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে জাপানি দার্শনিক তেনসিন ওকাকুরার ভারত ভ্রমণ এবং এশীয় একতার স্বপ্ন নিয়ে রচিত *Ideals Of East*[11] বইটির প্রকাশে বাঙালি যুবকদের মনে ইউরোপীয় শক্তির প্রতিস্পর্ধী রূপে বৃহত্তর এশীয় জাতীয়তাবাদের ভাবনা চাগাড় দিয়ে ওঠে। এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের অপ্রত্যাশিত জয় এই ভাবনাকে আরও ঘনীভূত করে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকের আধিপত্য থেকে আত্মপ্রতিরোধে উদ্যোগী জাতির কাছে ক্রমউদীয়মান জাপান ধরা দিতে থাকে অভিপ্রেত বিকল্প হিসেবে। উচ্চশিক্ষার্থে জাপানে যাওয়ার বিশেষত সেখানে গিয়ে প্রযুক্তি-কারিগরি-শিল্পশিক্ষার ব্যবহারিক পাঠ নিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বনের ঝোঁক তৈরি হয়। এবং ইউরোপ যাত্রীরা যেভাবে তাঁদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে স্বদেশ উন্নতির আবশ্যক পন্থা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতাকে স্বদেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়াকে দেশপ্রেম তথা দেশচিন্তারই অভিব্যক্তি মনে করেছিলেন, আমরা দেখি জাতীয়তাবাদী আবহে জাপান ভ্রমণকেও মন্মথনাথ বা সরোজনলিনী ঠিক একই মাত্রা দিতে চান এবং তাঁদের এশীয় একতায় বিশ্বাসী মনে অনুকরণের গ্লানিও থাকেনা।

[11] Okakura, Kakuzo, *Ideals of the East: The Spirit of Japanese Art* (Dover Publications, 2005).

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এশিয়ার দেশগুলি বিষয়ে আরও এক বিশেষ মনোভঙ্গী জন্ম নিতে শুরু করে। সিলভিয়ান লেভি প্রমুখ ফরাসি প্রাচ্যবিদের ব্যাখ্যাত 'বৃহত্তর ভারত'-এর সূত্র ধরে এদেশেও এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ-অঞ্চলের উপর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-দর্শনের প্রভাব বিষয়ে গবেষণার উৎসাহ তৈরি হয়। প্রসঙ্গত রাধাকুমুদ মুখার্জী ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' বা 'বৃহত্তর ভারত' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রাচীন ভারতের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস লেখার সময়, *Indian Shipping: A History of Seaborne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*[12] বইটিতে। প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক আধিপত্যের ইতিহাসচর্চার খাতিরে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে, গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এবং ইতিহাসের এই 'নতুন' ছকে, হিন্দু বা বৌদ্ধ সংযোগের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেশী দেশগুলি উপস্থাপিত হতে থাকে ভারতের একদা উপনিবেশ– 'প্রাচীন' ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিরই পরিবর্ধিত অংশ হিসেবে। এশিয়ার নানা দেশের সংস্কৃতিতে ভারতের প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রভাব প্রসারণের এই 'ইতিহাসবোধ' বর্তমানের খামতি ছাপিয়ে অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে একধরনের আত্মশ্লাঘার জন্ম দেয়। তাই যেমন রবীন্দ্রনাথ বা সুনীতিকুমারের ইন্দোনেশিয়া যাত্রাকালে বা সরলা দেবীর বর্মা ভ্রমণের প্রাক্কালে মনে হয়, এই যাত্রা "ভারতের ওপারে যাওয়া মাত্র, বৃহত্তর ভারতেরই আর এক কোণে।"[13]। আমরা বুঝতে পারি, এই গন্তব্যের অভিমুখে আসলে কোনো না দেখা নতুন দেশ বিষয়ে কৌতূহল থাকে না, বরং একধরনের আধ্যাত্মিক 'উপনিবেশায়নের' আকাঙ্ক্ষা

---

[12]Radha kumud Mookerji, *Indian Shipping: A History of Seaborne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times*, (Munshiram Manoharlal PVT LTD, 2020).

[13]সরলা দেবী চৌধুরাণী, "বর্ম্মা-যাত্রা", *শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বঙ্গমহিলার ভ্রমণ,* অভিজিৎ সেন ও উজ্জ্বল রায় (সম্পা.) (কলকাতা: স্ত্রী, ১৯৯৯), পৃষ্ঠা- ১৩৬।

জারিত থাকে যেখানে গন্তব্যস্থলগুলি 'বৃহত্তর ভারত' ভাবনারই এক বৈশিষ্ট্যবিহীন 'অপর'-এ পরিণত হয়। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই, জাভার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয় ভারতীয় বিদ্যার 'ভাঙাচোরা মূর্তি'। আমরা বুঝতে পারি এই ভ্রমণ আসলে পরাধীন জাতির ক্ষমতায়নের ভাষ্য হয়ে উঠতে চায়। জাপান ভ্রমণের বৃত্তান্তও যেমন শুধু জাপানিদের বিষয়ে ভালো-মন্দের পর্যবেক্ষণ বা শিক্ষাগ্রহণের পাঠেই সমাপ্ত হয় না, জাপান যে বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে বহুলাংশে ভারতের কাছে ঋণী সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ বারবার উঠে আসে। এবং রাজনৈতিকভাবে না হলেও, অতীতের মতোই বর্তমান প্রেক্ষিতেও আধ্যাত্মিকভাবে যে ভারত দেশে দেশে নিজের প্রভাব বিস্তারের কাজ করতে পারে সে কথা মাথায় রেখে, জাপানে হিন্দুধর্ম প্রচারের অভিনব প্রস্তাব দেন সারদাচরণ মিত্র, মন্মথনাথের *জাপান-প্রবাস*-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে।। এবং আমরা অনুধাবন করি, স্বদেশী আন্দোলনের পর্বে শুরু হওয়া এই প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের মধ্যে উপনিবেশিত জাতি ঔপনিবেশিকতার নিয়ন্ত্রণকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে আদতে ঔপনিবেশিক নানা পাঠ বা ক্ষমতার প্রকরণগুলিকেই আত্মস্থ করে নেয়। ঔপনিবেশিক শাসন বা আধিপত্য বিস্তার যে আদতে জাতিগত যোগ্যতা তথা পরাক্রমতার নমুনা সেই বিষয়টিকেই মান্যতা দিয়ে ফেলে। এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের সেই দরবারে যেহেতু তারা রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব কায়েম করতে পারেনা, তাই ক্ষমতায়নের বিকল্প সুলুকসন্ধান চলতে থাকে ভারতের অধ্যাত্মবাদ-ধর্ম-দর্শন বা অতীত গৌরবের প্রকল্প নির্মাণের মধ্যে দিয়ে।

ইউরোপ ও এশিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্তগুলির পাঠ বিশদে নিলে আমরা বুঝতে পারি, ঔপনিবেশিকতার দীর্ঘকালপর্বে ভ্রমণের গন্তব্য, অভিপ্রায়, পদ্ধতি এবং অবশ্যই ভ্রমণকারীর লিঙ্গের নিরিখে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কোনো একক বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভব হয়না। গন্তব্যকালে বা গন্তব্য শেষে যাত্রীরা কোনো একমাত্রিক, সমসত্ত্ব অভিজ্ঞতা নিয়েও ফেরেননা। ত্রৈলোক্যনাথ বা কৃষ্ণভাবিনীর কথনের সঙ্গে মেলানো যায়না অন্নদাশঙ্কর বা দুর্গাবতীর কথন।

যে চোখে সরোজনলিনী জাপানকে দেখতে চান সেভাবে দেখেননা রবীন্দ্রনাথ বা রামনাথ বিশ্বাস। আবার দুর্গাবতী, কৃষ্ণভাবিনী, সরোজনলিনী, হরিপ্রভার কথন এমন অনেক পর্যবেক্ষণকে ছুঁয়ে যায় যা চোখে আসেনা পুরুষদের কলমে। কিন্তু কথনগুলিকে যদি কোনো একটি সাধারণসূত্রের নিরিখে পাঠ করা যায়, তা হল প্রতিটি ভ্রমণই কোনো না কোনোভাবে উপনিবেশিত আত্মের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। পরাধীন জাতি তার বর্তমানে সঙ্গে যুঝতে বা নিজস্ব বিশিষ্টতা অন্বেষণে ভ্রমণ মারফৎ কখনো ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান নির্মাণ করে কখনো আবার নিজের অতীত গৌরব রোমন্থনের 'গুরুদায়িত্ব'-ও পালন করে। ফলত তাদের উপস্থাপনা ভ্রমণের বর্তমান অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে প্রায়শই অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে পিচ্ছিল হতে থাকে। বর্তমান বাস্তবের থেকেও জরুরি হয়ে ওঠে না দেখা অতীত বা কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ। এবং আমরা বুঝতে পারি, গন্তব্যগুলিকে তাঁরা আসলে নিছক দেখেননা, বরং তাঁদের নিজস্ব চাহিদা মেনে নির্মাণ করে নিতে চান। আবার সেই নির্মাণপ্রকল্পের সঙ্গে বাস্তবের অসামঞ্জস্যতাকেও এড়াতে পারেননা। প্রসঙ্গত আমি আমার গবেষণাপত্রের নামকরণেও 'ইউরোপ' বা' এশিয়া'র বদলে 'পাশ্চাত্য' এবং 'প্রাচ্য' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছি, কারণ আমার মনে হয়েছে যাত্রীদের মননে, গন্তব্যগুলি কেবল ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয় বরং উপনিবেশিতের মানসিক মানচিত্রে স্থিত দুটি বিশেষ ধারণাগত ক্যাটাগরি যেখানে বিশেষ কিছু আচরণ বা প্রকৃতিকে সমগ্র প্রাচ্যের স্বভাব হিসেবে দাবি করে 'প্রাচ্য' আর 'পাশ্চাত্য' নামক দুই বিপরীত যুগ্মপদকে নির্মাণ করে নিতে চাওয়া হয়। আবার এই দুই পদের ব্যঞ্জনারও বদল ঘটে চলে সময়ের তালে তালে। ইউরোপ ভ্রমণ যেমন ইউরোপ বিষয়ক ধারণাগুলিকে নানাভাবে ভাঙতে থাকে, তেমনই জাপানের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী উত্থান, দেশগুলি বিষয়ে অভিজ্ঞতার রকমফের এশীয় একতার আদর্শকে ধাক্কা দেয়। আবার বৃহত্তর ভারতের ভাবনা ভেবে ভ্রমণকারীরা যতই বিগলিত হন না কেন, সে সব দেশের মানুষের দৈনন্দিন যাপনে ভারত বিষয়ক ভাবনার আলদা কোনো তাৎপর্য যে নেই সে

কথাও সুনীতিকুমার বা সরলা দেবীর লেখায় সামনে চলে আসে। আর কল্পনা আর বাস্তবের এই যুগপৎ উপস্থিতি, পারস্পরিক ঠোকাঠুকি আর সাযুজ্যহীনতা, আত্মপরিচয়ের নতুন নতুন সম্ভাবনার মধ্যেই দোলায়মান থাকে উপবেশিতের খণ্ড চৈতন্য। এই দোলায়মানতা 'আত্ম' বিষয়ে পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনাকেও উস্কে দেয়। তাই ভ্রমণবৃত্তান্তগুলির মধ্যেও আমরা কোনো একটি অখণ্ড সমসত্ত্ব চিহ্নক দ্বারা আত্মকে চিহ্নিত করতে পারি না। বরং সেখানে উঠে আসে নানা পরস্পরবিরোধী চাপে আক্রান্ত আত্মের খণ্ডিত, প্রায়শই অসংলগ্ন এবং সদা বদলায়মান এক ছবি। ঠিক যেমন যতই কিছু নির্দিষ্ট নির্ধারিত চিহ্নকের দ্বারা গন্তব্যকে বুঝতে চাওয়া হোক না কেন বারেবারেই সেই সব চিহ্নকের সঙ্গে চিহ্ননের সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকে। একইভাবে, গন্তব্যের মতো আত্ম বিষয়েও কোনো চূড়ান্ত বা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত তৈরি হয়না বরং সিদ্ধান্তহীনতাই আত্মের এক বিশেষ চরিত্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, জাঁক দেরিদার *Différance*[14]-এর অনুষঙ্গ। différence আর defer- এই দুই শব্দের যুগলবন্দীতে তৈরি হওয়া শব্দভ্রমের সাহায্যে দেরিদা বোঝতে চেয়েছিলেন কোনো শব্দের মধ্যেই আসলে স্থির নিশ্চল কোনো অর্থ থাকেনা বরং সেখানে অর্থ বিষয়ক যাবতীয় নিশ্চয়তা বিষয়ে স্থগিতাদেশ জারী হয়। সেখানে সব অর্থই হয়ে ওঠে আপতিক ফলত তাদের ব্যঞ্জনাও হয় অফুরান। উত্তরগঠনবাদী এই ভাবনার সাপেক্ষে আমরা পাঠ করতে পারি আমাদের উপনিবেশিত পর্বের ভ্রমণ কথনগুলিকেও। অর্থাৎ উত্তরগঠনবাদীরা যেমন চিহ্নক (signifier) আর চিহ্ননের (signified) নির্দিষ্ট[15] আগল মুক্ত করে শব্দকে এক উন্মুক্ত পরিসরে পৌঁছে

---

[14]Derrida, Jacques, *of Grammatology*, Corrected Edition, Chakravorty Spivak (Ed.), (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1997).

[15]ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর শব্দকে যে চিহ্নায়নের প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন সেখানে চিহ্নক আর চিহ্ননের সম্পর্ক ছিল নিছক কাকতালীয়। তবে তিনি সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই কাকতালীয়তার মধ্যেই একটি স্থায়ী অর্থ গড়ে ওঠার কথা বলেছিলেন। কিন্তু অর্থগত এই স্থায়িত্ব বা একমাত্রিকতাকেই

দিতে চেয়েছিলেন সেখানে যেমন শব্দের কোনো স্থির বা চূড়ান্ত প্রতিকৃতি তৈরি হয়না। উপনিবেশিত আত্মের নানা খণ্ডচিত্রও আসলে তেমনই বহু ব্যঞ্জনা, বহু বিকল্প, বহু সম্ভাবনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই বাঙালির ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিকে আমরা বর্তমান সীমাবদ্ধতা আর আগামীর হতে চাওয়ার মধ্যে এক বিরামহীন সংলাপ বা ক্রমাগত দর কষাকষি হিসেবে পাঠ করতে পারি। সেখানে পরাধীন জাতির বিবর্তনের বা উন্নত ভবিষ্যৎ তৈরির চূড়ান্ত কোনো ধাপ বা সর্বজনগ্রাহ্য স্থির নিশ্চিত কোনো কাঠামো বা মডেল সামনে আসে না। আত্ম-অনুসন্ধানের এই আখ্যান আদতে কোনো পরিণতিকে বা 'হওয়াকে' সূচিতই করে না; বরং এক 'হয়ে ওঠার', এক ক্রমনির্মিতির ছবিকে তুলে ধরে। কারণ উপনিবেশিত বাঙালির আত্মনির্মাণের এই প্রকল্প অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ, অবিন্যস্ত এক প্রয়াস যেখানে বাস্তব আর বাসনার মাঝে সবসময়েই কিছু না কিছু ব্যবধান রয়ে যায়। আর এই ব্যবধানের মাঝেই অপসৃয়মান থাকে উপনিবেশিতের চৈতন্য যে চৈতন্য কখনই সমগ্র বা অখণ্ড নয় বরং নানা স্ববিরোধ আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরা খণ্ডচৈতন্য।

অস্বীকার করেন উত্তরগঠনবাদীরা। তাঁদের বিশ্লেষণে এই প্রক্রিয়া সদা প্রবহমান যেখানে ক্ষণস্থায়ী একটি অর্থসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরেই নতুন অর্থ তৈরির তাগিদে সেই পুরনো সম্পর্কটি ভেঙে যায়। (*Course in General Linguistics*, Baskin Wade (Trans.), Perry Meisel and Haun Saussy (Ed.) (Columbia University press, 1959).)